

‘প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা’ কর্তৃক নারীর ক্ষমতায় ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহযোগিতায় “প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা” কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার ছয়টি গ্রামে নারীর সহিংসতা প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশন উন্নয়নে কাজ করে আসছে। তাছাড়াও বাউল গানের মাধ্যমে নারীর সহিংসতা প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশন উন্নয়নে সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালন করছে। নির্যাতিত নারী ও দরিদ্র মহিলাদের মাঝে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ও সেলাই মেশিন বিতরণ করেছে। সংস্থাটি কর্তৃক এ যাবৎ ১০টি সেলাই মেশিন, ১৪টি গাভী, ৩৫টি ছাগল, ৪৪ খাছা মুরগী (প্রতিটিতে ৪টি করে মুরগী) প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১৪টি গাভী থেকে ২০টিগাভী হয়েছে, ৩৫ টি ছাগল থেকে প্রায় ৭০ টি ছাগল হয়েছে। সেলাই মেশিন দিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছে অনেকে। পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ২৫০ জন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করেছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সুফল ভোগী সদস্যদের আয়ের পথ সুগম হচ্ছে এবং পাশাপাশি সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।



বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রচেষ্টায় শত বছর বয়সী বৃদ্ধ মুগলুর ভাগ্যে জুটলো বয়স্ক ভাতার কার্ড

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার দিগদাইড় ইউনিয়নের শিহিপুর গ্রামের শত বছর বয়সী বৃদ্ধ মুগলুর ভাগ্যে জোটেনি বয়স্ক ভাতার কার্ড শিরোনামে দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ফাউন্ডেশনের বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহকে অবহিত করা হলে ঐ জেলায় ১৮ টি সহযোগী সংস্থার পক্ষ হতে ঐ বৃদ্ধকে ২১ হাজার টাকা নগদ অর্থ, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদান ও আমৃত্যু পর্যন্ত চিকিৎসা সেবার দায়িত্ব নেয়া হয়।

শত বয়সী বৃদ্ধ মুগলু প্রামাণিক জন প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বয়স্ক ভাতার কার্ড না পাওয়ায় যখন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক মুগলুর সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয় তখনই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং আর বিলম্ব না করে জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর বৃদ্ধ মুগলু প্রামাণিকের হাতে বয়স্ক ভাতার কার্ড তুলে দেন। এ বয়সে বয়স্ক ভাতা ও সহযোগীতা পেয়ে বেজায় খুশি মুগলু প্রামাণিক।



সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সহযোগীতা প্রদান করছেন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহায়তায় ভূমিহীনদের অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ‘ভূমিহীন উন্নয়ন সংস্থা (এলডিও)’-এর পরিচালনায় সংগঠিত ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৯ম পর্যায় অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সহায়তায় আধুনিক চাষাবাদের কলা-কৌশল, রোগ-বালাই দমন, জৈব কৃষি/কম্পোজ তৈরী ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ভূমিহীন কৃষকরা চাষাবাদ করে বাম্পার ইরি-বোরো ধানের ফলন ফলাতে সক্ষম হয়েছে। আইনী ও ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বরাদ্দে সহায়তার মাধ্যমে জেলা বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ৫৪৭ টি ভূমিহীন পরিবার খাস জমির দলিল পেয়েছে এবং ২৮৭টি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। উপকারভোগীরা শাক-সবজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শাক-সবজি উৎপাদন করতে পেরেছে। বনজ ও ফলজ চারা চারা তাঁরা পেয়ে উপকৃত হয়েছে। তাছাড়া ভূমিহীনদের ছেলে-মেয়েকে স্কুলে লেখা-পড়া করানোরও সুযোগ পাচ্ছে।

মুক্তাগাছার বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে উপকরণ বিতরণ ও বিএনএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন

‘গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস)’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে পঞ্চম পর্যায়ে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থায়নে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, দুগ্ধ অসহায়, বিধবা এবং এতিম নারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ভার্মি কম্পোষ্ট (কেচো সার) উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১০০ জন দুগ্ধ অসহায়, বিধবা এবং এতিম নারীদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্ড বিতরণ করে। ২৫ জন দুগ্ধ অসহায়, বিধবা এবং এতিম নারীদের বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভার্মি কম্পোষ্ট (কেচো সার) উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণ এবং ২৫ জন দুগ্ধ অসহায়, বিধবা এবং এতিম নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদের মধ্যে বিনামূল্যে হাঁস ও মুরগী বিতরণ করেছেন। কৃষি অধিদপ্তর-এর উপ-পরিচালক ভার্মি কম্পোষ্ট (কেচো সার) উৎপাদনকারীদের উৎপাদনাগার, সার ব্যবহারকারীদের পানের বরজ, সবজীবাগান পরিদর্শন করে কেঁচো সার ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এ সার ব্যবহার করায় পানে ও সবজীতে কীটপতঙ্গের আক্রমণ কম হচ্ছে বলে জানান। পরিবেশ বান্ধব কেঁচো সার এলাকায় বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করছে এবং দিন দিন এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫২,০০০/- (বায়ান্ন হাজার) টাকার কেঁচো সার বিক্রি করা হয়েছে।



গ্রাউস কর্মকর্তা সরাসরি ফলোআপ করছেন

কেঁচো সার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ বিশেষ



উপকারভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুষ্ঠান

মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা কদমতলা গ্রামের উকিল মিয়ার মেয়ে আফরোজা খাতুন-এর সঙ্গে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব গ্রামের আজিত মিয়ার ছেলে মনিরুল ইসলামের ২০১২ সালের মার্চ মাসে বিয়ে হয়। গ্রামের সুখী দম্পতি ছিল আফরোজা ও মনিরুল। কিন্তু যৌতুকের লোভ মনিরুল সম্বরণ করতে পারেনি। বিবাহকালীন দেওয়া যৌতুকের টাকা ফুরিয়ে গেলে শুরু হয় আফরোজার উপর অত্যাচার। নির্যাতনের মাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠলে আফরোজা বাধ্য হয়ে প্রায় ৮ মাস আগে তার পিতার বাড়ী চলে আসে। কিন্তু গরিব পিতার বাড়ীতে খুব কষ্টে দিন কাটে। অসহায় আফরোজা তার অধিকার আদায়ের জন্য বাধ্য হয়ে ১৪/০৯/২০১৩ তারিখে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে মেহেরপুর শাখায় মনিরুলের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে সালিশ বৈঠকের দিন ধার্য করত দু'পক্ষকেই জানিয়ে দেয়া হয়। নির্ধারিত দিন উভয় পক্ষ নিজ নিজ লোকজনসহ হাজির হলে অনুষ্ঠিত সালিশ বৈঠকে বিরোধের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে উভয় পক্ষের মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে একটি সালিশ বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সদস্যবৃন্দ স্বামী-স্ত্রীর মতামত নিয়ে স্বামী-স্ত্রী একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার শর্তে আফরোজা-মনিরুলের বিরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করে। আফরোজাকে মনিরুল তার নিজ গৃহে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা সুখে-শান্তিতে সংসার করছে।



‘আস বাংলাদেশ’ পাল্টে দিয়েছে মারুফ-এর জীবন

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে কচুয়া পট্টিতে অবস্থিত যৌন পল্লীতে নজরুল ইসলাম ও মারুফা বেগম দম্পতির ঘরে ৬ এপ্রিল ২০০৫ সালে জন্ম গ্রহণ করে মোঃ মারুফ। বর্তমান তার বয়স ১০ বছর। মা মারুফা একজন যৌন কর্মী। মা যৌন কর্মী হওয়ায় পেশায় যখন ব্যস্ত থাকে মারুফ যখন হাটি হাটি পা পা তখন থেকেই তাকে লোহার শিকল অথবা দড়ি দিয়ে খাটের পায়ার সাথে অথবা বারান্দার খুটির সাথে বেধে রাখা হতো। এভাবে চলতে থাকে মারুফের শৈশব কাল। অন্য শিশুদের ন্যায় স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষা ও বিনোদনের মত মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয় মারুফ। ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। এভাবেই পার হয় মারুফের জীবনের চারটি বছর।

২০০৮ সালে ‘এ্যাসোসিয়েশন ফর সোসাইটিস হেলপলেন্স (আস) বাংলাদেশ’, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বাগেরহাট শহরে শুরু করে অধিকার বঞ্চিত রেল বস্তি ও সুইপার কলোনির শিশুদের নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, “শিশু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশ কেন্দ্র”। ৩০ জন শিশুকে নিয়ে শুরু হয় এ কার্যক্রম। এ ৩০ জন শিশুর মধ্যে মারুফ ছিল একটু ব্যতিক্রম। চার বছর বয়স হলেও সে স্কুলে এসে ঠিকভাবে বসে থাকতে পারত না। শুয়ে পড়ত, কথা বললে উত্তর দিত না, খেলতে পারত না। শিকল অথবা দড়ি দিয়ে বেধে রাখার কারণে তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় এবং তার চলাফেরার গতি হয়ে পড়ে সীমিত। আস বাংলাদেশ পরিচালিত শিশু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশ কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার পর মারুফের প্রতি নেওয়া হয় বিশেষ যত্ন। শারীরিক বিকাশের জন্য তাকে নিয়মিত বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করানো হতো এবং বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, গান, ছড়া পাঠ করানো হতো। ছয় মাস যেতে না যেতেই মারুফের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এক বছর তত্ত্বাবধানের পর মারুফ শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হয়ে ওঠে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর মারুফ ভর্তি হয় বাগেরহাট বাজার পৌর কিডার গার্টেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে। বর্তমানে মারুফ ঐ বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্র। তার রোল নং-৩। এখন তার মধ্যে আর কোন প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় না। অন্যান্য শিশুদের মতো স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছে



মোঃ মারুফ বর্তমান ছবি।

অসহায় আদিবাসী বৃদ্ধকে সহায়তা

‘বয়স্ক ভাতার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন বিজয় সিং’ শিরোনামে ২৪ মার্চ ২০১৫ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের দৃষ্টিগোচর হয়। বিএনএফ কর্তৃক বিষয়টি পাঁচবিবি উপজেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহকে অবহিত করা হলে সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র ভূমিহীন আদিবাসী বিজয় সিং যতদিন বয়স্ক ভাতা না পান ততদিন পর্যন্ত প্রতি মাসে তাঁকে ৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেয়া হয়। তাছাড়া জয়পুরহাট জেলায় কর্মরত সকল সহযোগী সংস্থা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে বৃদ্ধকে একটি গাভী প্রদান করে। এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



বিজয় সিং-কে গাভী প্রদান করছেন

রোখসানার দারিদ্র জয়

জয়পুরহাট সদর উপজেলার বুধইল গ্রামের জনাব ইনসান-এর স্ত্রী রোখসানা খাতুন। রোখসানার স্বামী পেশায় দিন মজুর। খুব কষ্টে চলে তাদের সংসার। অভাবের জন্য স্বামীকে ঢাকায় যেতে হয়েছিল রিক্সা চালাতে। তাঁর ২ মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের নাম বন্যা এবং ছোট মেয়ে স্বর্ণা। অর্থের অভাবে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে জরিপের মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচন করতে যেয়ে ‘নর্থবেঙ্গল রুরাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি (এন আর ডি এস)’-এর নজরে আসে। বিষয়টি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ‘এন আর ডি এস’ তৃতীয় পর্যায়ের অনুদানে রোখসানাকে ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ২০১২ সালের মার্চ মাসে বিনামূল্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের উন্নত মানের একটি ছাগী প্রদান করে। ছাগীটি প্রথমবার ২টি বাচ্চা, দ্বিতীয়বার ৩ টি বাচ্চা, তৃতীয়বার ৩টি বাচ্চা এবং চতুর্থবারে ৩টি বাচ্চা প্রসব করে। দ্বিতীয় প্রসবের বাচ্চা হতে আরও ৩টি বাচ্চা পায়। এ ভাবে মোট ১৪ টি বাচ্চা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ ছাগী ও ৪ টি খাসী। ৪ টি খাসী ২০,৫০০/- টাকায় বিক্রি করে ঘরে টিন দিয়েছে, বড় মেয়ের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও প্রাইভেট পড়ায় খরচ করেছে এবং বাড়ীতে ১টি নলকূপ স্থাপন করেছে। খাসী রেখেছে ছোট মেয়ে স্বর্ণার এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও প্রাইভেট পড়ার জন্য। বর্তমানে তার অবশিষ্ট ছাগলের বাজার মূল্য প্রায় ৩০,০০০/- টাকা। রোখসানা খাতুন ছাগল পালনের মাধ্যমে তার হতদরিদ্র পরিবারে হাসি ফুটিয়েছে। বর্তমানে এখন তার মেয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখছে। সে ছাগল পালন প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া এবং বিনামূল্যে একটি ছাগী দেয়ায় ‘এন আর ডি এস’ এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞ।



উপকারভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করছেন

নুরুল ইসলাম-এর কন্যা সন্তানের সফলতা

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন ১৬নং মির্জাপুর ইউনিয়নের হয়বতপুর গ্রামের ৪৫ বছর বয়সী বাসিন্দা শেফালি বেগম। স্বামীর মোঃ নুরুল ইসলাম পেশায় ভ্রাম্যমান ‘নর-সুন্দর’। তাদের কোন কৃষি জমি নেই। ০.০৪ শতাংশ জমিতে টিনের চালায় তাদের বসবাস। তার চারটি কন্যা সন্তান। অভাবের কারণে লেখাপড়া করাতে না পেরে দুই মেয়েকে বিবাহ দেন। সংসার চালানো এবং দুই মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে ভীষণ দুঃখচিন্তায় পড়েন। শেফালি বেগম ২০১৩ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ‘বৈরাটী সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)’ হতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণ



শেষে বিএসইউএস তাঁকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মূল্যের উন্নত জাতের একটি দেশী ছাগী বিনামূল্যে প্রদান করে। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ছাগীটি লালন-পালন শুরু করে এবং ১ম বার দুটি বাচ্চা পায়। তৃতীয় মেয়ে মোছাঃ নিলুফা খাতুন-এর বিএসসি (গণিত) ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে তিনি বাধ্য হয়ে বাচ্চা ছাগল দুটি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকায় বিক্রি করে শঠিবাড়ী ডিগ্রী কলেজে ফরম পূরণের টাকা জমা দেন এবং মোছাঃ নিলুফা খাতুন ২০১৪ সালে বিএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে শঠিবাড়ী ডিগ্রী কলেজে থেকে একমাত্র সেই ১ম বিভাগে পাস করে। ৪র্থ মেয়ে মোছাঃ নাজিয়া খাতুন ২০১৪ সালে বৈরাটী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে JSC পরীক্ষায় গোল্ডেন A+ পেয়ে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। শেফালি খাতুন বলেন তাঁর মেয়েরা লেখাপড়ায় ভাল। কিন্তু অভাবের কারণে তাদের কোন পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াতে পারে না। তিনি আরও বলেন ভালো খাবার খাওয়াতে পারলে মেয়েরা হয়তো আরও ভাল করতো।

তিনি তার ছাগল পালনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে, ছাগল পালন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ফলে তাঁর ছাগলের তেমন কোন রোগ-ব্যাদি হয়নি এবং বর্তমানে তাঁর ছাগল সংখ্যা ৩ (তিন)টি। তিনি আরও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, ঐ ছাগল থেকে ছাগলের একটি বড় খামার গড়ে তুলবেন এবং পরিবারকে স্বাবলম্বী করবেন। তিনি এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পরিবারের সকলের জন্য দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। মোছাঃ নিলুফা খাতুন ২০১৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শঠিবাড়ী ডিগ্রী কলেজ হতে বিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে তাঁকে সম্মাননা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হাওর পাড়ের সফল গীতা রানী

গীতা রানী বর্মন (২৮), স্বামী রবীন্দ্র বর্মন (৩৪), গ্রামঃ সলফ, ইউনিয়নঃ পূর্ববীরগাঁও, উপজেলাঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ জেলাঃ সুনামগঞ্জ। তাঁর স্বামীই সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। স্বামীঅন্যের জাল ও নৌকায় ভাগে নিয়ে মাছ ধরে। এক ছেলে, এক মেয়ে ও বৃদ্ধা শ্বশুড়ী নিয়ে ৫ সদস্যের টানা পোড়নের সংসার তার। বছরে ৩ থেকে ৪ মাস মাছ ধরে বিক্রি করতে পারে। বাকী সময় কাজ না থাকায় পরিবারে সকল সদস্যকে নিয়ে অন্য কাজের আশায় সিলেটের ভোলাগঞ্জে যেতে হয়। এভাবেই কষ্টে চলছিল গীতা রানী’র সংসার।



গীতা রানী হাঁসের খাবার খাওয়াচ্ছেন

২০১৩ সালে পত্নী উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (পদ্মা) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় অতি দরিদ্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত সংস্থা হতে তাঁকে বিনামূল্যে ৫টি বড় হাঁস দেয়া হয়। মাস তিনেক পর ৪টি হাঁস প্রতিদিন ডিম দেয়া শুরু করে। ডিম ফুটিয়ে তিনি ৩০ টি হাঁসের বাচ্চা পায়। অবশিষ্ট ডিম বাজারে বিক্রি করে। বাচ্চা হাঁসও ডিম দিতে শুরু করে। এখন প্রতিদি বেশ কিছু ডিম বিক্রি করে থাকে। এর কিছুদিন পর পদ্মা সংস্থার কর্মীর সহযোগিতায় যুব উন্নয়নের মাধ্যমে সেলাই কাজের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে পদ্মা’র সহযোগিতায় একটি পুরাতন সেলাই মেশিন ক্রয় করে বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করে। হাঁস পালন, সেলাই কাজ ও স্বামীর দৈনিক আয়ে মাসে সংসার খরচ বাদে ৫০০/- থেকে ১০০০/- টাকা জমা করতে পারে। ডিম ও হাঁস বিক্রি করে বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছে ও পরিবেশ বান্ধব চুলা কিনেছে। গীতা রানীর ছেলে-মেয়ে এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। কাজের জন্য তাদের আর গ্রাম ছেড়ে বাহিরে যেতে হয় না। এখন সে ৫ সদস্যের সংসার নিয়ে সুখে আছে। ভবিষ্যত চিন্তা করে ব্যাংকে ২০০ টাকার ডিপোজিট চালু করেছে। গীতা রানীর বর্তমান অবস্থা দেখে হাওর পাড়ের অনেক নারীরা হাঁস পালন করতে শুরু করেছে।

সেলাইয়ে শিখার আর্থিক সাফল্য

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার আক্রাশাল গ্রামের পিতা-আবুল হোসেন, মাতা- রাহেলা বেগমের ৫জন ছেলে মেয়ের মধ্যে শিখা তাদের ২য় মেয়ে। শিখার বয়স যখন ১২ বৎসর তখন তার মা ব্রেইন স্ট্রোক করে এবং প্যারালাইসড হয়ে যায়। তার বাবা কায়িক পরিশ্রম করে যা উপার্জন করে তাতে তাদের সংসার চলে না। কোন রকম দিন কাটাত। মা অসুস্থ, বাবার রোজগারও তেমন একটা ভাল না হওয়ায় লেখাপড়া বন্ধের পথে। এরই মাঝে শিখার মা মারা যায়। মায়ের মৃত্যুর শোক ভুলতে না ভুলতেই

তার বাবা ২য় বিয়ে করে সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। বাবা আলাদা হয়ে যাবার পর শিখা ও তার ভাই বোনদের জীবনে নেমে এল আমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার। কিভাবে নিজেকে ও ভাই বোনদের নিয়ে চলব কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। টিউশনি করে যা পেত তা দিয়ে কোন রকমে নিজের খরচ ও ভাই বোনদের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিল শিখা। জীবন সংগ্রামের এ মুহূর্তেও শিখা লেখাপড়ার হাল ছাড়েনি। ঠিক সেই সময় ‘জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা’-এর ম্যানেজার জনাব বেলায়েত হোসেনের মাধ্যমে শিখা জানতে পেল বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় ‘জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা’ ৪ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করবে।



শিখা এ সংস্থা হতে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে একটি সেলাই মেশিন পায় এবং গ্রামে সেলাইয়ের কাজ করতে থাকে। এখন সে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০০/- টাকা থেকে ৪০০০/- টাকা আয় করতে পারছে। শিখা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে খুবই ভালোভাবে সেলাই এর কাজ শেখায় জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা তাকে সেলাই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়। এতে করে তাদের সংসারের অভাব অনেকটা দূর হয়েছে। সে এত কষ্টের মাঝেও লেখাপড়া চালিয়ে এইচএসসি পাশ করেছে। বর্তমানে সে বি এ অধ্যয়ন করছে।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থার শেরে বাংলা সম্মাননা পদক অর্জন

‘মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা (এমএমইউএস)’, সিরাজগঞ্জ ২০০৯ সাল হতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর অর্থায়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সমাজের দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের নিমিত্ত হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সামাজিক উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য সংস্থাটি “শেরে বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন-ঢাকা” হতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস-২০১৫ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি’র কাছ থেকে শেরে বাংলা সম্মাননা পদক ক্রেস্ট ও সনদপত্র গ্রহণ করেন।



মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা (এমএমইউএস) সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি’র কাছ থেকে শেরে বাংলা সম্মাননা পদক ক্রেস্ট ও সনদপত্র গ্রহণ করছেন।

দারিদ্রকে জয় করল রাবেয়া

সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পৌরসভার রানী গ্রামের ৩২ বছর বয়সী রাবেয়া বেগম। স্বামী মোঃ আব্দুস সাত্তার পেশায় শ্রমিক, তাদের কোন কৃষিজমি নাই। একটা ঘর উঠানোর জন্য সামান্য জায়গা আছে তাদের। ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ০৬ জন। অভাবের কারণে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করানো খুব কঠিন হয়ে পড়ছিল। সংসার চালানো নিয়ে ভিষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে তাঁর স্বামী। এমন সময় রাবেয়া বেগম ২০১২ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ‘সমতা উন্নয়ন সংস্থা (এসইউএস)’ হতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এসইউএস তাঁকে বিনামূল্যে উন্নত জাতের একটি ছাগী প্রদান করে। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে রাবেয়া ছাগীটি লালন-পালন শুরু করেন। ১ম বছরে দু’টি বাচ্চা, ২য় ও তৃতীয় বছরে আরো ৩টি বাচ্চা দেয় ছাগীটি। প্রথম বছরের বাচ্চাটি বিক্রয় করে ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ বহন করে। পরবর্তীতে রাবেয়া আরও ৩টি ছাগল করে। এ পর্যন্ত রাবেয়া ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার ছাগল বিক্রি করেছে। ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে একখানা আবাদী জমি খায়খালাসি রেখেছে রাবেয়া। জমিতে ফসল ফলিয়ে তারা স্বনির্ভর হতে শুরু করেছে। ৪র্থ বছরেও ছাগীটি একটি বাচ্চা প্রসব করায় রাবেয়ার বর্তমান ছাগলের সংখ্যা ০৩টি, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা। তাদের সংসারে সবার মুখে ফুটেছে হাসি, রাবেয়া সমতা উন্নয়ন সংস্থা (এসইউএস) এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া কামনা করেন।

ভেড়া পালন করে রুমি বেগম এখন স্বাবলম্বী

বগুড়া সদর উপজেলার ঘোলাগাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জনাব মোহাম্মদ আলি একজন কাঠ মিস্ত্রি। ৫ জনের সংসার তার। নিজের এক বিধা জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতি কষ্টে সংসার চালায়। যে দিন কাজ পায় না সেদিন খুবই কষ্টে কাটাতে হয়। মোহাম্মদ আলী

-এর স্ত্রী রুমি বেগম একজন গৃহবধু। বিগত ৫ বছর যাবৎ তিনি ‘আলোর পথে’ সমিতির সদস্য। আলোর পথের কর্মী বিরু রজককে মাঝে মাঝে রুমি বেগম কাজ যোগাড় করে দেয়ার কথা বলত। আলোর পথের কর্মী বিরু রজক বিষয়টি নিয়ে অফিসে আলাপ করে এবং ২০১৩ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানের অর্থে রুমি বেগমকে ২ দিনের ভেড়া পালন প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে একটি বিনামূল্যে ভেড়া প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং বিরু রজক-এর পরামর্শে রুমি বেগম ভেড়া লালন পালন করতে থাকে। ১টি ভেড়া হতে ২ বছরে ১১টি ভেড়া পেয়েছে রুমি বেগম। এ বছর ১১টি ভেড়া হতে ৫টি বাচ্চা ভেড়া ১৫,০০০/- টাকায় বিক্রি করে বড় মেয়ের বিয়ের ব্যয় নির্বাহ করে। অবশিষ্ট ৬টির মধ্যে দু’এক মাসের মধ্যে ২টি ভেড়া বাচ্চা দিবে। তিনি ভেড়াগুলিকে অনেক যত্ন করেন। তিনি মনে করেন যে কোন বিপদে-আপদে এ ভেড়াই তাঁকে সাহায্য করবে।



নিজের ভেড়াকে খাওয়াচ্ছেন রুমি বেগম

ঘুরে দাড়ালো ফরিদা

বরগুনা জেলাধীন বরগুনা সদর উপজেলার ২ নং গৌরিচন্না ইউনিয়নের খাজুরতলা গ্রামের বাল্য বধু ফরিদাকে মাত্র ১৩ বছর বয়সে অভাবী পিতার সংসার ত্যাগ করতে হল, হল না আর লেখা পড়া। দিন মজুর সোহরাব হাওলাদার-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হয়ে সংসারের ঘানি টানতে শুরু করেন। ৩ বছরে ২ টি কন্যা সন্তানের মা হলেন। সন্তানসহ সংসারের ভরণ পোষণ করা স্বামীর একার আয়ে চালানো অসম্ভব। বাধ্য হলেন অন্যের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতেন। ৫ বছরের মাথায় স্বামী মরণ ব্যাধি ক্যাপারে আক্রান্ত হয়। শেষ সম্বল ৪ শতাংশ জমি বিক্রির টাকায় চিকিৎসা করে ও শেষ রক্ষা হল না। স্বামীর মৃত্যুতে অকালে বিধবা হয়ে ২ কন্যা সন্তান নিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে। ফরিদার সংসারে নেমে আসে অন্ধকার। ‘অন্বেষা সমাজ উন্নয়ন সোসাইটি’সহ আরো বেশ কয়েকটি স্থানীয় এনজিও-এর সহায়তায় বড় মেয়ে ১০ম শ্রেণিতে পড়ছে, ছোট মেয়ে ৭ম শ্রেণিতে পড়ছে। ফরিদা ঝিয়ের কাজ করে খাদ্যের যোগান দিতে পারছিল না। মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ কে দেবে? ‘অন্বেষা’ তার শিক্ষাবৃত্তি তহবিল থেকে বই কেনার অর্থ যোগান দিয়ে সাহায্য করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ‘অন্বেষা’ সেলাই প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফরিদাকে একজন প্রশিক্ষার্থী



সংস্থা হতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত সেলাই মেশিনে সেলাইয়ে কাজ করছেন ফরিদা

করে সাড়ে ৪ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁকে একটি বিনামূল্যে নতুন সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। সেলাই মেশিনের হুইলের সাথে ফরিদার ভাগ্যের চাকাও ঘুরতে শুরু করে। খাজুরতলা প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরা ফরিদার কাছে কাপড় সেলাই করার জন্য ভীড় করে। ৩/৪ কি.মি. দূরে বাজারে আর যেতে হয় না। ফলে ফরিদার আয়ের দরজাও খুলতে থাকে। বর্তমানে ফরিদা গড়ে প্রতি মাসে ১,৮০০/- থেকে ২,২০০/- টাকা আয় করে। স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের জন্য নাস্তা, জামা-কাপড় এবং বই-খাতা-কলমের টাকার জন্য অন্যের কাছে হাত পাতে হয় না। এখন বিয়ের কাজ ছেড়ে ফরিদা হয়ে গেল একজন সফল নারী দর্জি। সাধারণ জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য অন্তেষা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনা মোঃ শামসউদ্দীন খান পিএইচআর মানবাধিকার চ্যাম্পিয়ন-২০১৫ নির্বাচিত হন।

দারিদ্র হতে মুক্ত পেল ফুলকুন বেগম

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নে সানকিভাঙ্গা গ্রামের জনাব মজনুর স্ত্রী ফুলকুন বেগম। ফুলছড়ি নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে মজনু সানকিভাঙ্গা ১নং ক্রস বাঁধে ঘর তুলে খুঁজে পায় কোন রকম মাথা গোজার ঠাঁই। স্বামী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও পেশায় দিন মজুর। তাদের তিন সন্তান। দরিদ্রের কষাঘাতে ফুলকুন বেগম নিষ্পেষিত। এলাকায় সব সময় কাজ না থাকায় কাজের



নিজ গরুর সামনে ফুলকুন বেগম

জন্য স্বামীকে ঢাকা যেতে হয়। ফুলকুন বেগম পরের বাড়ীতে বি এর কাজ করে কোন রকমে সন্তানদের নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে দিনাতিপাত করেন। 'দুঃস্থ জন কল্যাণ সংস্থা' ভরতখালী ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জরিপ করতে গিয়ে ফুলকুন বেগমকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করে। ফুলকুন বেগমের সাথে কথা বললে তিনি জানান ভিক্ষে করে হলেও তাঁর ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেন। দরিদ্র পরিবারে ফুলকুন বেগমের কথা শুনে জরিপ কর্মী বিচলিত হন এবং ২০০৮ সালে 'দুঃস্থ জন কল্যাণ সংস্থা' বিএনএফ অনুদানের অর্থে তাকে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনা মূল্যে একটি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের উন্নত মানের একটি ছাগী প্রদান করে। ছাগীটি প্রথম বারে দুইটি বাচ্চা, দ্বিতীয় বারে দুইটি বাচ্চা, তারপর বাচ্চা গুলি বড় হয়ে সেগুলিও বাচ্চা দিতে থাকে। এভাবে দু'বৎসরে ১২টি ছাগলের একটি দল গড়ে ওঠে। ১২টি ছাগলের মধ্যে দু'টি খাসি বিক্রি করে একটি

গরুর বাছুর ক্রয় করেন। বাকি ছাগল ৫০,০০০/- টাকায় বিক্রি করে ১৬ শতক জমি বর্গা নেন। গাভীর দুধ বিক্রি করে ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ চালান। জমি থেকে বৎসরের খাবারের সংস্থান হয়। বর্তমানে বড় ছেলে বিএ পড়ছে, দ্বিতীয় ছেলে অষ্টম শ্রেণীতে এবং ছোট ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। স্বামীর আয়ের অর্থ জমা থাকছে। এভাবে ফুলকুন বেগম দারিদ্র বিমোচন করে ছেলেদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখছে।

প্রতিবন্ধীদের সহযোগীতায় বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থা

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার ঝাএল ইউনিয়নের বড়ধুল গ্রামের বাসিন্দা জনাব মোঃ আব্দুল মালেক পেশায় একজন দিন মজুর। জমি জমা নেই বললেই চলে। আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ৬ বছরের সিয়াম তাঁর ছেলে। সিয়াম স্বাভাবিকভাবে জন্ম গ্রহণ করলেও বয়স এক বছর হলে পরিবার লক্ষ্য করল ডাকলে সহজে সাড়া দেয় না, তার সামনে খেলনা ধরলে তাকায় না, কথা বলে না। অনেক সমস্যা দেখা দেয়। বয়স অনুযায়ী বসতে, দাঁড়াতে, হাটসহ কিছুই করতে পারে না। সিয়ামের মায়ের নিকট হতে জানা যায় তিনি যখন ৯ মাসের গর্ভবতী তখন হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে ব্যাথা পেয়েছিলেন। ২০১২ সালে 'কামারখন্দ পল্লী

উন্নয়ন সংস্থা'র উন্নয়ন কর্মী প্রতিবন্ধী তালিকায় সিয়ামের নাম লিপিবদ্ধ করে। সংস্থাটি তার সমস্যার আলোকে থেরাপী প্রদান করে আসছে এবং তার মাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর সহায়তায় 'কামারখন্দ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' সিয়ামকে দাঁড়ানোর জন্য সহায়ক উপকরণ হিসেবে একটি 'স্ট্যান্ড ইন টেবিল' প্রদান করে এবং এটি নিয়মিত ব্যবহার করতে বলা হয়। সিয়ামের পরিবার খুবই দরিদ্র হওয়ার কারণে তাকে চিকিৎসা পুষ্টি কিছুই দিতে পারে না। উপকরণ ব্যবহার করে বর্তমানে সিয়াম 'স্ট্যান্ড ইন টেবিল'-এ একাই দাঁড়াতে পারে। উপকরণ ব্যবহার করে সিয়াম একটি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করেছে। উপকরণটি পেয়ে সিয়াম এবং তার পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশি। সিয়াম বর্তমানে স্বাভাবিক শিশুর মত প্রায় চলাফেরা করে। প্রতিবন্ধীরাও যে সহযোগীতা পেলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে সিয়াম তার প্রমাণ।



'স্ট্যান্ড ইন টেবিল'-এ সিয়াম

রিক প্রতিবন্ধী আলমাহমুদের মানবেতর জীবন

আলোয়া বেগম। সিরাজগঞ্জ জেলাধীন তাড়াশ উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের বিনসাড়া গ্রামের (সরকারী রাস্তার ধারে খাসের জায়গায়) বাসিন্দা। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে মোঃ আলমাহমুদ, মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং মোহাঃ কাজলী খাতুন শারীরিক প্রতিবন্ধী। অপর একজন মোঃ আবদুল আহাদ আংশিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। আলমাহমুদ-এর বাবা-মা মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন। যদিও এখনও তাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু ধারণা করা হয় তাদের বাবা-মার রক্তের আরএইচ ফ্যাক্টরজনিত কারণে একই পরিবারে ৫ ভাই-বোনের মধ্যে ৪ জন জন্মগত প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। পিতা মোঃ আবুল কাসেম-এর 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা। বাবা-মাসহ সাত জনের সংসারে আলমাহমুদের বাবা এবং ভাই ছাড়া উপার্জনের আর কেউ নেই। তাও আবার আংশিক প্রতিবন্ধীতার কারণে মোঃ আবদুল আহাদ কর্মক্ষেত্রে মজুরী বৈষম্যের শিকার।

আলমাহমুদের বর্তমান বয়স ২৮ বছর। দুই যুগেরও বেশি সময় পর্যন্ত যখন আলমাহমুদ তার শারীরিক প্রতিবন্ধীতার কারণে নিজ ঘরে নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে মানবেতর জীবন-যাপন করছিল। ঠিক তখনই সাক্ষাৎ হয় সিরাজগঞ্জ জেলায় কর্মরত 'পরিবর্তন' সংস্থার সামাজিক যোগাযোগকারী জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা-এর সাথে। আলাপকালে আলমাহমুদ নিজের বেশ কিছু চাহিদা/ইচ্ছার ব্যাপারে জানায় 'পরিবর্তন'-এর কর্মীকে। তারপর 'পরিবর্তন' সংস্থার অনুকূলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চতুর্থ পর্যায়ের অনুদানে "প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন" প্রকল্পের আওতায় আলমাহমুদ এবং তার বোন শারীরিক প্রতিবন্ধী কাজলীকে দুইটি ছাগল প্রদান করা হয়। প্রায় দেড় বছরে দুইটি 'মা' ছাগল বেশ কয়েকটি বাচ্চা দেয়। সেগুলো লালন পালন করে বিক্রি করে আলমাহমুদের কিছু মূলধনের যোগাড় হয়। পরবর্তীতে ফাউন্ডেশনের পঞ্চম পর্যায়ের অনুদানে আলমাহমুদকে একটি সহায়ক উপকরণ (হুইলচেয়ার) প্রদান করা হলে আলমাহমুদ কিছু একটা করতে হবে বলে সংকল্পবদ্ধ হয়। বর্তমানে আলমাহমুদ স্থানীয় বিনসাড়া বাজারে ক্ষুদ্র পরিসরে মুদি দোকানের ব্যবসা করছে।



আলমাহমুদের নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে জীবন যাপনের অবসান ঘটেছে। একটি হইলচেয়ার আলমাহমুদকে অতি মানবেতর জীবন যাপন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। প্রতিদিন সে হইলচেয়ারে নিজ বাড়ি থেকে নিকটবর্তী বাজারে গিয়ে তার মুদি দোকানের ব্যবসা করছে। দোকানে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে সাতশ টাকা বিক্রি হচ্ছে। যা থেকে আয় হচ্ছে এক থেকে দেবশো টাকা। ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও আলমাহমুদ একটি হইলচেয়ারকে সঙ্গি করে সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে এবং প্রতিদিন আয় রোজগার করে পারিবারিকভাবেও সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

আলীহিম রোগমুক্ত হয়ে আবার সংসারের হাল ধরল

চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গোপিনাথপুর গ্রামে পানিতে আর্সেনিক থাকায় গ্রামের জনগণ এ পানি পান করে আর্সেনিকজনিত বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ গ্রামে ৪ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা আর্সেনিকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিষয়টি জানার পর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ‘গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’ ফাউন্ডেশনের অনুদানে গোপিনাথপুর গ্রামে কর্মসূচি গ্রহণ করে। ‘গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’ আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করলে কি কি ক্ষতি হয় এবং আর্সেনিক কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে জনসচেতনামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করেছে এবং পোষ্টার, স্টিকার বিলি করেছে। এছাড়া সংস্থাটি এলাকায় এবং ১০০টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক পরীক্ষা করে লাল ও সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করেছে এবং সনোফিল্টার বিতরণ করেছেন।



আর্সেনিক প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠানে আলীহিম

আলীহিমের হাতে আর্সেনিকজনিত রোগের ক্ষত

গোপিনাথপুর গ্রামের মোঃ আলীহিম মিয়া আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সে সকল প্রকার কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে। গ্রামের লোকজন ভেবে নিয়েছিল আলীহিম হয়তো আর বাঁচবে না। ‘গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র পরামর্শক্রমে আর্সেনিক প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য মেনে ও বিনামূল্যে দেওয়া সনোফিলটারের বিশুদ্ধ পানি পান করে আলীহিম সুস্থ হতে থাকে। বর্তমানে আলীহিম পুরোপুরি সুস্থ, সে এখন সম্পূর্ণ কর্মক্ষম। এখন ঐ গ্রামে আর্সেনিকজনিত রোগ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

ইভটিজিং বন্ধে সফল ‘বরসা ফাউন্ডেশন’

‘বরসা ফাউন্ডেশন’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় ৮ম পর্যায়ের অনুদানের অর্থে ফরিদপুর জেলায় বোয়ালমারী উপজেলায় যৌন হয়রানী প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় এলাকার উত্যাগকারী বখাটে যুবকরা সচেতন হয়েছে এবং এখন তারা নিজেদেরকে আড়াল করে রাখছে। ফলে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার গেটে এখন তাদের দেখা যায় না। বোয়ালমারী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া একজন ছাত্রীকে একটি ছেলে স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিদিন উত্যাগ করতো। চলার পথে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে হত মেয়েটিকে। এক

দিন স্কুলে যাওয়ার পথে ছেলেটি মেয়েটির ওড়না টেনে ধরে এবং পথ আগলে দাঁড়ায়। বিষয়টি ‘বরসা ফাউন্ডেশন’ কে বরসা ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কানিজ ফাতেমার মাধ্যমে তৎক্ষণিক মোবাইল কোর্ট বসিয়ে ছেলেটিকে গ্রেফতার করত ৬ মাসের জেল প্রদান করে। উক্ত ঘটনা বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের পর এলাকার স্কুল কলেজের মেয়েরা সচেতন হয়ে ওঠে এবং ইভটিজারদের বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে এলাকা থেকে ইভটিজিং দূর হয়েছে। সংস্থাটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সভা করা ছাড়াও বিলবোর্ড, সাইন বোর্ড এর মাধ্যমে এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এছাড়াও স্কুল কলেজের দেওয়ালে ও জনসম্মুখে পোষ্টার, স্টিকার ও লিফলেট লাগানো ও বিতরণ করেছে। যাহা ইভটিজিং প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা হিসাবে কাজ করছে।



বানর রক্ষায় বিএনএফ

মাদারীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বন্দর হিসেবে চরমুগুরীয়া বিশেষভাবে পরিচিত। এ এলাকার আরও পরিচিতি পায় রেসাস বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে। অত্র এলাকার মানুষের বসবাসের পূর্বে বানরের বসবাস ছিল উন্মুক্ত ও অব্যাহত। কালের বিবর্তনে মানুষের বসতি ও নগরায়নের কারণে তাদের বিচরণের এলাকা সংকুচিত হয়ে আসছে। তাদের আহারের সংকট দেখা যায়, ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। খাবারের খোঁজে তারা লোকালয়ে যায় এবং উৎপাত করতে থাকে। ফলে তাদের প্রতি মানুষের ভালবাসা কমতে থাকে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বানর প্রজাতির গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারীভাবে এদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা একেবারে অপ্রতুল। সংস্থার অনুসন্ধানে তথ্য মোতাবেক দেখা যায় যে বন বিভাগের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৫০ দিন, ১ দিন পরপর খাবার পরিবেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ সপ্তাহে ৩ দিন মোট ১৫৬ দিন খাবার পরিবেশনের পরিকল্পনা করেছে। তাই সরকারীভাবে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০৬ দিন খাবার পাবে। যা তাদের পরিসংখ্যানে ২৫০০ বানরের জন্যে অপ্রতুল। এর আলোকে ‘মুক্তির পথ মহিলা সংস্থা’ বানর রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বরাবরে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বানর সংরক্ষণ কর্মসূচি দাখিল করে। বিএনএফ এটিকে সৃজনশীল প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে ও অনুমোদন প্রদান করে। কর্মসূচির মেয়াদ ২৬/০২/২০১৫ তারিখ থেকে ১৬/০১/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত। ‘মুক্তির পথ মহিলা সংস্থা’ ০১/০৩/২০১৫ থেকে ৩০/০৮/২০১৫ পর্যন্ত কর্মসূচিটি অতি সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করে যা এলাকায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।



সংস্থা প্রতি সপ্তাহের শনিবার ১ দিন বানরের আহার বিতরণ করে। বর্তমানে বানরকূল শনিবার আসলে ২টি স্পটে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এলাকার স্কুলের বাচ্চারা আনন্দ পায় তারাও খাদ্য বিতরণ করে, যা পূর্বে ছিল না। এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্যে সহায়তা করেছেন। তারা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের বানরের প্রতি ভালবাসা ও ব্যবহার নিয়ম নীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। এলাকায় বানরের উপদ্রব অনেক কমে গেছে, মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব সৃষ্টি হচ্ছে। ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মন্তব্য করে যে, পরবর্তীতে যদি প্রতি দিনের জন্য আহার দেয়া যায় তবে এ এলাকা পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে এবং বানরের খাদ্যের চাহিদা মিটবে।

সেলাই মেশিনে স্বাবলম্বী বৃষ্টি রাণী

বৃষ্টি রাণী বয়স ১৪ বৎসর, পিতা শ্রী আশিষ কুমার দাস, গ্রাম-নিজ বাটিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ (কালিতলা), উপজেলা-সারিয়াকান্দি, জেলা-বগুড়া। তারা চার ভাই বোন। চার ভাই বোনের মধ্যে বৃষ্টি রাণী ২য়। তার বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। ভাইয়ের বয়স ৯ বছর। সব ছোট বোনের বয়স ৬ বছর। বর্তমানে তাদের পরিবারে লোকসংখ্যা ৫ জন। তাদের কোন জমা-জমি না থাকায় যমুনা নদীর তীরবর্তী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া টিনের দ্বারা একটি দোচালা ঘর তৈরি করে পরিবার পরিজনসহ বসবাস করে। বৃষ্টির পিতা আশিষ কুমার দাস মাত্র ১৫০০/- টাকা বেতনে কাজলা ইউনিয়ন পরিষদে টোকিদার হিসেবে কাজ করেন। তাদের পরিবারে আর কোন উপার্জনক্ষম লোক না থাকায় অধিকাংশ সময়েই তাদেরকে অর্ধাহারে-অনাহারে দিনাতিপাত করতে হয়।



বৃষ্টির রাণীর ছোট ভাই স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীতে এবং বৃষ্টি রাণী সারিয়াকান্দি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে পড়ালেখা করা অবস্থায় খরচ যোগাতে না পারার কারণে কিছু দিন পূর্বে বিদ্যালয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় ‘পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা’র নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি জানতে পারেন এবং তিনি নিজে বৃষ্টি রাণীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হন এবং বৃষ্টি রাণীকে ‘পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা’ পরিচালিত যমুনা নারী উন্নয়ন প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৬ষ্ঠ পর্যায়ের অনুদান দ্বারা পরিচালিত সেলাই প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে তাকে তালিকাভুক্ত করে ০৪ মাসব্যাপী সেলাই (দর্জি) প্রশিক্ষণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণ শেষে একটি সেলাই মেশিন বিনামূল্যে প্রদান করে। বৃষ্টি রাণীকে পুনরায় পড়ালেখা করার জন্য অনুরোধ করলে বৃষ্টি রাণী পুনরায় পড়া লেখা শুরু করে। অবসর সময়ে বৃষ্টি রাণী পার্শ্ববর্তী লোকজনের জামা কাপড় তৈরী করে প্রতি মাসে গড়ে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা উপার্জন করে। উক্ত উপার্জনের অর্থ দ্বারা বৃষ্টি নিজের কাপড় চোপড় ও স্কুলের খরচ যোগায় এবং প্রতি মাসে তার পিতা-মাতাকে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা প্রদান করে। বৃষ্টি রাণী ভবিষ্যতের জন্য দৈনিক ১০ থেকে ২০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা করে। বৃষ্টি রাণী ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে ‘পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা’ হতে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও একটি সেলাই মেশিন পেয়ে বৃষ্টি রাণী এক দিকে যেমন স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের দারিদ্র্যতা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনিভাবে পরিবারে ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি রাণীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএনএফ-এর উদ্যোগে পানীয় জল পেলেন চাম্পা খাতুন

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার আহম্মদপুর ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামের আব্দুল হামিদের স্ত্রী চাম্পা খাতুন। নিজস্ব কোন জায়গা জমি না থাকায় সরকারী খাস জমিতে ঘর তুলে খুঁজে পায় কোন রকমে মাথা গোজার ঠাঁই। স্বামী আব্দুল হামিদ পেশায় দিন মজুর। তাদের দুই সন্তান। এক ছেলে ও এক মেয়ে। দরিদ্রের কষাঘাতে নিষ্পেষিত চাম্পা খাতুন। এলাকায় সব সময় কাজ না থাকায় তার স্বামীকে মাঝে মধ্যেই বিকল্প কাজের সন্ধানে অন্যত্র যেতে হয়। স্বামীর আয়ে সংসার চালানো অসম্ভব। ফলে বাধ্য হয়েই চাম্পা খাতুনকেও পরের বাড়ীতে কাজ করে কোন রকমে, দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে না খেয়ে সন্তান সন্ততি নিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। শত অভাব অনটনের মধ্যেও বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় খাবার পানির। সামর্থ্য না থাকায় নিজের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাই সারা দিন অনেক খাটুনির পরও গাল-মন্দ শুনে নীরবে সহ্য করে দূর হতে অন্যের বাড়ী থেকে সংগ্রহ করতে হয় খাবার পানি। অনেক সময় অন্যের বাড়ীতে পানি আনতে গেলে অনেক ডাকাডাকি করলেও গেট খোলে না বাড়ীর মালিক। নিরাশ হয়ে ফিরেও আসতে হয় তাঁকে।



লোকমুখে চাম্পা খাতুন শুনেছেন বিএনএফ-এর সহযোগী সংগঠন 'যমুনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (জেএসকেএস)' দরিদ্র পরিবারগুলোকে নলকূপ দিয়ে থাকে। চাম্পা খাতুন ও তার আশেপাশের প্রতিবেশীরা জেএসকেএস অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে জেএসকেএস-এর টিম সরেজমিনে জরিপ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাম্পা খাতুনকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করে ২০১৪ সালে একটি নলকূপ স্থাপন করে দেয়। চাম্পা খাতুন নলকূপ পেয়ে বেজায় খুশী। তিনি বলেন, বিএনএফ এবং 'যমুনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা'র নিকট আমি এবং আমার প্রতিবেশীরা চির কৃতজ্ঞ। আমাকে এখন অন্যের বাড়ী থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয় না। আমার বাড়ি থেকেই এখন আমার প্রতিবেশীরা খাবার পানি নিয়ে থাকেন।

বিএনএফ-এর অর্থানুকূলে হোসানে আরা-এর আয় বর্ধন

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার অন্তর্গত ০৭ নং নাভারণ ইউনিয়নের নাভারণ গ্রামের জনাব সামছুর রহমানের স্ত্রী হোসানে আরা খাতুন। হোসানে আরা-এর স্বামী একজন পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত। খুব কষ্টে চলে তাদের সংসার। সংসারে অভাবের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। এমনকি অনেক সময় অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হতো। তার সংসারে ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে। মেয়েদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে এবং বড় ছেলে বিয়ে করার পর থেকে বাবার সংসার থেকে ভিন্ন।



ছাগল হাতে হোসানে আরা খাতুন

এখন হোসানে আরা ছোট ছেলে নিয়ে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছেন। অর্থের অভাবে ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখাতে পারেন নাই। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে জরীপের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করতে গিয়ে ‘রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আর, ডি, এফ)’-এর নজরে আসে দরিদ্র অসহায় পরিবারটি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় আর, ডি, এফ-এর তৃতীয় পর্যায়ের অনুদানে হোসানে আরা-কে ছাগল পালন বিষয়ে সরকারি উপজেলা পশু পালন কর্মকর্তা দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ২০১২ সালে এপ্রিল মাসে বিনামূল্যে ১টি উন্নত জাতের মা ছাগল প্রদান করে। মা ছাগল ১ম বার ২টি বাচ্চা, ২য় বার ২টি বাচ্চা, ৩য় বার ২টি বাচ্চা এবং ৪র্থ বার ২টি বাচ্চা প্রদান করে। তবে আনন্দের বিষয় হচ্ছে প্রথম বারের বাচ্চা হতে আরো ২টি বাচ্চা পাওয়া যায়। এভাবে তার মোট ১১টি ছাগলের বাচ্চা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি মা ছাগল ও ৪টি খাসি। ৪টি খাসি ও ২টি মা ছাগল ২৩,৪০০/- (তেইশ হাজার চারশত) টাকায় বিক্রি করেন। বিক্রয়কৃত টাকা দিয়ে থাকার ঘরের বেড়া ও চালে টিন দেন এবং ছাগলের থাকার ঘরটি নতুনভাবে তৈরী করেন। বাকি টাকা দিয়ে হোসানে আরা স্বামীর চিকিৎসা করান ও কিছু টাকা সংসারে খরচ করেন। তবে হোসানে আরা-এর বর্তমানে ৫টি মা ছাগল আছে। তার মধ্যে ৩টি মা ছাগলের পেটে বাচ্চা এসেছে। উক্ত ছাগলগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য ২৬,৫০০/- (ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত) টাকা।

হোসানে আরা খাতুন ছাগল পালনের ফলে তার হত দরিদ্র পরিবারে শান্তি ফিরে পেয়েছে। সে তার মা ছাগলকে সোনার হরিণ বলে আখ্যায়িত করেছে। সে ছাগল পালন প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া এবং বিনামূল্যে একটি মা ছাগল দেয়ার ফলে ‘রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আর, ডি, এফ) এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিএনএফ-এর অনুদানে গরু পেয়ে অভাব দূর হল মুক্তা বেগমের

নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন নওগাঁ পৌরসভার এক অবহেলিত গ্রাম জগন্নাথপুর। সে গ্রামে স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করেন মুক্তা বেগম। বর্তমানে তাঁদের তিন সন্তান। দারিদ্রতার মধ্যেই তাঁদের সংসার জীবন। স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রী। এলাকায় সব সময় কাজ না থাকায় বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই বেকার বসে থাকতে হয় স্বামীকে। মুক্তা বেগম পরের বাড়িতে কাজ করে কোন রকম দু'বেলার আহার যোগায়। 'বরেন্দ্র কর্ম সংস্থা (বকস)' অতি দরিদ্র মুক্তা বেগমকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করে। ২০১১ সালে 'বকস' "প্রাণি সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন" কর্মসূচির আওতায় বিএনএফ-এর অনুদানে তাঁকে গরু পালন প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে একটি বকনা বাছুর প্রদান করে।



বকনা বাছুরটি বড় হয়ে ২০১৩ সালে একটি বকনা বাছুর প্রসব করে। তখন গাভীটি প্রায় ৩ কেজি দুধ দেয়া শুরু করে। এভাবে প্রায় ৯ মাস দুধ দেয়ার পর ২০১৫ সালের মে মাসে একটি এড়ি বাছুর প্রসব করে। বর্তমানে গাভীটি প্রতিদিন প্রায় ৪ কেজি দুধ দিচ্ছে। দুধ ও গোবর থেকে জ্বালানী তৈরী করে বিক্রি করেন। গরুর খাওয়া খরচ বাদে প্রতি মাসে প্রায় ৬ হাজার টাকা আয় হয়। বর্তমানে তাঁর ৩টি গরু আছে। গাভীর দুধ বিক্রি করে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগান। বড় ছেলে ৮ম শ্রেণিতে এবং দ্বিতীয় মেয়ে ২য় শ্রেণিতে পড়ছে। এখন স্বামী ও তাঁর আয়ে সংসারের অভাব দূর হয়েছে। এভাবে আয় বৃদ্ধি করে তিনি ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান।